পৃথিবীর ডায়েরি

e-paper

বছর ১৬, সংখ্যা: ৯ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | জানুয়ারি ২০১৬

জানা অজানা

কুকুর,বেড়ালের জল পান

কুকুর আর বেড়ালে তফাৎ অনেক। দেখলে মনে হয় বেড়ালের তুলনায় কুকুর অনেক আলাভোলা প্রাণী। দুড়ুম-দাড়ুম কাজ করা তার স্বভাব। ছুটোছুটি, হাঁকডাক, ল্যাজ নেড়ে আহ্লাদ, সবকিছুর মধ্যে এক ছেলেমানুষি আছে। অন্য দিকে বেড়াল খুবই বিচক্ষণ। চলনে-বলনে কোথাও যেন বেচালের লক্ষণ নেই। সবই খুব পরিপাটি, ফিটফাট, অভিজাত, দাম্ভিক। এমনকী দুটি প্রাণী যখন জল খায়, তখনও তফাৎটা ফুটে ওঠে। কুকুর কিছুটা ছড়িয়ে খায়; আর বেড়ালের হল নিখুঁত সেবন, দু ফোঁটাও পাত্রের বাইরে পড়ে না সচরাচর।

কুকুর যখন জল খায় তার জিভ এত দ্রুত চলে যে খালি চোখে তা ঠিক বোঝা যায় না। বিজ্ঞানীরা তাই যন্ত্রের সাহায্যে তা নিরীক্ষণ করেছেন। দেখা গেছে, তারা জলের মধ্যে জিভের খানিকটা ডুবিয়ে, তাকে হাতির শুঁড়ের মত তলার দিকে পাকিয়ে, জল তুলে নেয় মুখের মধ্যে। ফলে জলের মধ্যে জিভের বেশ খানিকটা বার বার ডুবিয়ে খুব দ্রুত জল তুলতে থাকায় কিছুটা ছড়ায় চারপাশে।

বেড়ালও একই পদ্ধতিতে জল পান করে, কিন্তু নিজের জিভ জলে ডোবায় না। ওপরের স্তর থেকে জিভ দিয়ে আলত করে, অনেকটা চেখে দেখার ভঙ্গিতে সে জল তোলে মুখের মধ্যে। ফলে জল ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা রাখে না সে।

দিক্‌চিহ্ন, মানচিত্র বদলে যাচ্ছে

আকাশপথে দীর্ঘ উড়ান কঠীন হয়ে উঠছে পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রে

শীত এসেছে। এবার তাদেরও আসার পালা। হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে প্রবল ঠান্ডায় জমে যাওয়া পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ছেড়ে তারা আসবে দক্ষিণে, যেখানে ঠান্ডা অনেকটাই সহনীয়, সূর্যের আলোয় যেখানে উপোভোগ করা যায় হাল্কা উত্তাপ।

প্রতি বছরই তারা আসে – শীতের পরিযায়ী পাখিরা। উত্তর মেরুর কোল ঘেঁষা অঞ্চল থেকে কেউ উড়ে যায় দক্ষিণ আমেরিকায়, কেউ আসে মধ্য এশিয়ার নানা দেশে, ভারতীয় উপমহাদেশে, নদ-নদী, হিমালয় পেরিয়ে তারা আসে এই বাংলাতেও। প্রতি বছর তাদের ওই দীর্ঘ উড়ান, নিয়ম করে তাদের ওই পথ চিনে নির্ভুল আসা আর যাওয়া আজও বিস্মিত করে বিজ্ঞানীদের। মানুষের তৈরি উড়োজাহাজ তো থাকে যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। সেগুলিই বলে দেয় উচ্চতা, বাইরের তাপমাত্রা, ঠিক করে দেয় আকাশ পথে চলার দিক, পাইলটকে সজাগ করে দেয় অবতরণের সময় হলে।

পাখিদের সে সব যন্ত্রপাতি নেই। তাদের তা প্রয়োজনও হয় না। তাদের ছোট্ট মাথার মধ্যে রয়েছে যে আরও ছোট মগজ বা 'ব্রেন' তাতেই ঠাসা আছে নানা ক্ষমতাসমপন্ন কলকব্জা যা তদের নির্ভুল দিক নির্দেশ করে। নির্দেশই আকাশে ওড়ার উচ্চতা কমিয়ে বাড়িয়ে, বাতাসে অক্সিজেনের ঠিক ঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করে, সাগর মহাসাগরের ওপর দিয়ে তাদের নিয়ে চলে সুদূর সব দেশের পরিচিত গন্তব্যে।

কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাদের সুপরিচিত সব যাত্রাপথ। কারণ, যে অজস্র দিকচিহ্ন দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে চলে, যেগুলি দেখে তারা স্থির করে ডাইনে বেঁকতে হবে না বাঁয়ে, সোজা উড়ে চলতে হবে না কি আকাশ থেকে অবতরণের সময় হয়েছে, সেগুলি সব বদলে যাচ্ছে বছর বছর। অর্থাৎ, যেখানে ছিল অরণ্য এই সেদিনও, সেখানে হয়তো গাছের বদলে এখন মাথা তুলে আছে কারখানার চিমনি। যেখানে হয়তো ছিল খোলা মাঠ, উড়তে উড়তে তারা হয়তো মাঠের বদলে সেখানে তারা দেখছে বাড়ির সারি। যেখানে তারা জানত আছে এক জলাশয়, সেটিকে তারা দেখতে পায় না আর। হ্রদের বদলে সেখানে এখন খটখটে খোলা মাঠ। যা ছিল তাদের নিরিবিলিতে কয়েক মাস কাটিয়ে যাওয়া ভিন দেশের বহু চেনা আস্তানা, সেখানে যেন আজ **এবার ২ পাতায়**

মাছের ছানারা পথ হারাবে, ভুলে যাবে কোথায় আশ্রয়

পৃথিবীর সমুদ্রগুলি বদলে যাচ্ছে। আর সমুদ্র বদলাচ্ছে কারণ বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ছে আর সেই বাড়তি অংশের কিছুটা সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে তাতেও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এমনটা চলতে থাকলে সমুদ্রের প্রাণীরা ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ইউনিভারসিটির গবেষকরা বলছেন সমুদ্রের জলে বাড়তে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড বহু প্রাণীকে বিপদে ফেলবে, বিশেষ করে মাছের ছানাদের।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি হলে মাছের ছানারা সহজেই পথ হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়ে যেখানে তারা বড় হয়ে উঠতে পারে সেখানে না গিয়ে তারা চলে যায় উল্টো দিকে, যেখানে বিপদ ওৎ পেতে থাকে। এমনটা ঘটে কারণ বিষিয়ে যাওয়া জলে ক্ষুদে মাছেদের মগজ কাজ করে না। সমুদ্রের নীচে নানা সঙ্কেতের মানে করতে না পেরে তারা বুঝতে পারে না কোথায় আছে বিপদ আর কোথায় নিরাপত্তা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এখন থেকে সাবধান না হলে, আজ থেকে ১০০ বছর পরে সমুদ্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড এতটাই বেড়ে যাবে যে মাছের বাচ্চারা বড় হয়ে ওঠার সুযোগই পাবে না।

সূত্র: ইউরেকা অ্যালার্ট

কুঁজো তিমি আসছে, চিন্তায় সাদা ভালুক

তিমিদের জীবনে এখন বেশ বদল ঘটছে। তার ফলে তাদের মনে এখন আনন্দের হাওয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পোলার বেয়ার বা সাদা ভালুকদের কপালে। আবহাওয়া যতই বদলাচ্ছে, বাড়ছে উষ্ণতা, ততই উত্তর মেরুতে বরফ গলছে। এবং সেই সঙ্গে, খুব একটু হলেও, সমুদ্রের জলের তাপ বাড়ছে। আর এর ফলেই 'হাম্পব্যাক হোয়েল' অথবা 'কুঁজো তিমি' সমাজে হয়তো এখন খুশির ভাব।

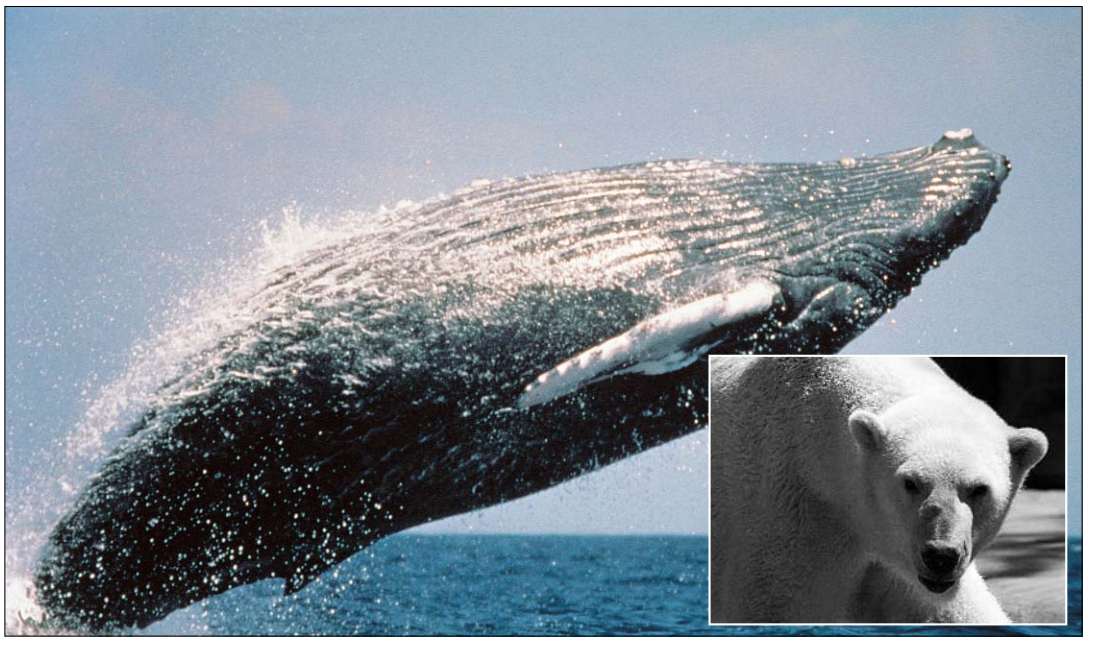

কারণ এতকাল কুঁজো তিমি, উত্তর মেরুর সমুদ্র বা আর্কটিক সাগরে বিশেষ প্রবেশ করত না। সেখানকার প্রকান্ড সব হিমবাহ আর হিমশীতল জল, তাদেরর রক্ত হিম করে দিত। কুঁজো তিমিরা আর্কটিক সাগরের আসেপাশে ঘুরে বেড়াত, শিকার করত, আর গ্রীষ্মকাল ছাড়া তার মধ্যে বিশেষ প্রবেশ করার চেষ্ট করত না। কিন্তু আর্কটিক সাগরে গ্রীষ্মের সেই অতিথিরা আজ আর ঋতুর বাঁধন মানছে না। তারা সেখানে হাজির হচ্ছে অসময়েও। আর ঠিক এ কারণেই চিন্তায় পড়েছে সাদা ভালুকরা।

প্রকৃতি সকলের কথা ভেবে একটা নিয়ম সৃষ্টি করেছিল। প্রাণীকুলে কে কখন কোথায় যাবে তা সেই নিয়ম মেনেই ঠিক হত। সকলে সব সময় সব জায়গায় যাওয়ার ছাড়পত্র পাবে এমন কথা ছিল না। ফলে গরমের সময় কুঁজো তিমিরা আসত, আর্কটিক সাগরে ঘুরে বেড়ানো আর ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া চলত। কিন্তু শীতের আমেজ অনুভব করলেই তারা চলে যেত অন্যত্র। তখন সেই মেরু অঞ্চলে সাদা ভালুকরাই হয়ে উঠত একছত্র অধিপতি। এখনও মূলতঃ তাইই হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কুঁজো তিমিরা থেকে যাচ্ছে অনেক বেশি সময় ধরে, আর তার ফলে টান পড়ছে ভালুকদের খাবারে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ফ্র্যানসিসকোতে অনুষ্ঠিত সমুদ্রের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে এক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে এ কথা জানা গেছে।

শীত আসার আগে সাদা ভালুকদের প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেই খাবার তাদের শরীরে বেশ ভাল পরিমান মেদ সৃষ্টি করে। মেরু অঞ্চলে যখন প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে আর চারদিক বরফে ঢাকা পড়ে যায়, তখন ওই ভালুকরা এক লম্বা শীতঘুম দেয়। তখন তারা বিশেষ চলাফেরা করে না, শিকারেও বেরয় না তেমন। বছরের সেই কঠীন দিনগুলিতে তাদের শরীরে জমে থাকা মেদই তাদের শক্তি জোগায়, বাঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু এখন তিমিরা তাদের খাবারে ভাগ বসাতে শুরু করেছে। তাই সাদা ভালুকদের চিন্তিত হয়ে পড়ার যথেষ্ঠ কারণ আছে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

পরিযায়ী পাখি

১ পাতা থেকে

দ্রুতগামী গাড়ির গমগমে শব্দ। উড়তে উড়তে তাদের মগজের যন্ত্রগুলো স্থির করেতে পারে না তারা এবার কোথায় এসে পৌঁছল। তাদের মাথার মধ্যে যে ম্যাপ নিয়ে তারা পাড়ি দিয়েছিল, নীচে মাটির মানচিত্রের সঙ্গে তার যেন অমিল আনেক। সঠিক গন্তব্যে পৌঁছন তাই দিন দিন কঠীন হয়ে উঠছে।

'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্রমাগত এই অদল বদলের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে অনেক পরিযায়ী পাখি, তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে গত ৩০ বছরে। তাঁদের মতে, পরিযায়ী পাখিরা চলার পথে যেখানে যেখানে খাবারের জন্যে নামে, আর তাদের শেষ গন্তব্য, যেখানে তারা কাটায় বেশ কিছু দিন, সেগুলিকে রক্ষা করা না গেলে ওই অতিথি পাখিদের রক্ষা করাও দুষ্কর হয়ে উঠবে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

পাখিটি আকারে খুদে, বুদ্ধিতে বিরাট

ওজন মাত্র ৫ আউন্স বা ১৫০ গ্রামেরও কম। তার ব্রেন বা মগজের আকার যে কত ছোট তা অনুমান করা যায়। কিন্তু হলে কি হবে ওই ছোট্ট ক্লার্ক'স নাটক্রেকার পাখির মগজেই ঠাসা থাকে ১০ হাজার মানচিত্র! শুধু তাই নয়, সে মানচিত্র একেবারে সঠিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তৈরি হয়ে যায় যখন সে পাইনের দানা নানান জায়গায় গুঁজে গুঁজে রাখে। এবং সেই মানচিত্র অনুসরণ করে সহজেই তারা খুঁজেও বার করে ফেলে কোথায় রেখেছে তাদের গচ্ছিত ধন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমন আশ্চর্য ক্ষমতা তাদের।

আবিষ্কারক উইলিয়াম ক্লার্কের নামেই তার নামকরণ হয়েছে। সমতল থেকে প্রায় ১২/১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় বসবাসকারী ওই নাটক্রেকাররা পাইন ফলের বীজ মিনিটে ৩২ টা করে সংগ্রহ করতে পারে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, গলার মধ্যে তাদের একটি বিশেষ থলি থাকে। যে থলিতে তারা ওই বীজ ভরে নেয়।

প্রতি বছর গরমের সময় তারা পাইন গাছের ফল থেকে খুব দ্রুততায় হাজার হাজার বীজ খুঁটে বার করে গলার ওই থলিতেই পুরে নেয়। জীববিজ্ঞানী ডায়না টমব্যাক তাদের নিয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে কারও মুখে প্রায় শ'দেড়েক বীজও মিলেছে। নাহ, খাওয়ার জন্য নয়। সেই বীজ তারা আশেপাশে মাটির তলায়, গাছের ফাঁক ফোকরে, পাহাড়ে পাথরের খাঁজে গুঁজে রাখে। আর তাদের লুকনোর জায়গা কি এক আধটা? দেখা গেছে এক একটি ক্লার্কস নাটক্রেকার ৫০০০ - ২০,০০০ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বীজ লুকিয়ে রাখে। এবং যখন শীত আসে তখন হাজার হাজার জায়গায় গুঁজে রাখা ওই বীজ পুনরুদ্ধারে নেমে পড়ে তারা। কারণ তখন তাদের ছানাদের খাওয়ানোর সময়। আর কী আশ্চর্য সেই কাজে নেমে তারা নির্ভুল ভাবে কয়েক মাস আগে পুঁতে রাখা সেই ফলের বীজ ঠিক খুঁটে বার করে নেয়। বিস্ময়কর তাদের স্মৃতি শক্তি। এখনও অবশ্য জানা যায় নি কোন বিশেষ ক্ষমতা বলে ওই খুদে পাখিরা এমন অসম্ভব কাজটি করে। তবে ওই বীজ পুঁতে রাখার দরুন ইতস্তত বহু পাইন চারাই অচিরে লকলকিয়ে ওঠে। যা থেকে আবার ভবিষ্যতে তৈরি হয়ে যায় প্রাকৃতিক পাইন অরণ্যও।

জেরেনাক

জেরেনাক মানে সোমালি ভাষায় জিরাফের গলা। দেখলে প্রথমে জিরাফের ছানাই মনে হবে। শরীরটা বড়, লম্বা গলা আর মাথাটা খুব ছোট্ট। অবশ্য চোখ আর কান দুটো তার বেশ বড়। এক ধরনের হরিণ প্রজাতির প্রায় অপরিচিত এই প্রাণীটি পূর্ব আফ্রিকা, তানজানিয়া, মাসাই স্টেপ ও সম্বরু'র বাসিন্দা। কাঁটাঝোপ, গাছের পাতা-ফুল-ফল-কুঁড়ি ইত্যাদিই তার খাদ্য। তবে সারা জীবনে সে এক ফোঁটা জল না খেয়েও কাটাতে পারে। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতাই তার মরুভূমিতে টিকে থাকার সহায়ক হয়। দলবদ্ধ প্রাণী হলেও প্রসবের সময় মা দল ছেড়ে বাইরে কোথাও লুকিয়ে পড়ে সন্তানের নিরাপত্তার জন্যই। এই জেরেনাকরাও এখন হুমকির মুখে।

ফেলে আসা বছরে নতুন যা জানা গেল

■ প্রায় এক ঘন্টা ধরে তার অপারেশন হল। কোষ্ঠকাঠিন্যে সে কষ্ট পাচ্ছিল। আর সেই কষ্ট থেকে তাকে রেহাই দিতেই তার মালিক নরফকের বাসিন্দা সোজা হাজির হয়েছিল টল বার্ন ভেটেরিনারি সেন্টারে। সেখানে দু'জন নার্স সঙ্গে নিয়ে মিস বেটহেল যার অপারেশন করলেন সে ছোট্ট একটি গোল্ডফিশ। রীতিমতো অজ্ঞান করিয়ে তার অপারেশন হল। খরচ হল আমাদের টাকায় প্রায় ৩০ হাজার।

■ বিজ্ঞানীরা বিশাল আকারের, প্রায় মানুষের সমান লবস্টার আবিষ্কার করেছেন। যে প্রায় ৪৮ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। তার জীবাশ্ম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার দেহের দু'পাশেই পাখনা ছিল।

■ মানুষের মতোই গোরিলাদেরও মিউজিক বা গান বাজনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে। গবেষকরা তিনটি গোরিলার সামনে নানা ধরনের মিউজিক বাজিয়ে লক্ষ করেছেন যে, সেই মিউজিক সম্পর্কে গোরিলাদের প্রতিক্রিয়াও আলাদা হয়। অরণ্যের নানা প্রাকৃতিক শব্দ, ক্ল্যাসিকাল মিউজিক ও রক মিউজিক বাজিয়ে দেখেছেন তাদের এক একজনের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম হয়েছে।

■ সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে পৃথিবীর চারটি মহাদেশে চিন সহ ১০ দেশের সবথেকে জনপ্রিয় রং হল নীল।

■ ক্যাঙারুরা বেশিরভাগই ন্যাটা হয়। অর্থাৎ বাঁহাতে কাজ চালায়। তাদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা যাচ্ছে নিজেদের সাফ সুতরো করার সময় এবং খাওয়ার সময় তারা বাঁহাতই ব্যবহার করে।

সূত্রঃ বিবিসি.কম

এখনও প্রতি বছর ৪ মিমি উঁচু হচ্ছে এভারেস্ট

জেনে রাখা ভাল

মাউন্ট এভারেস্ট, নেপালে যা 'সাগরমাথা' বলেও পরিচিত, বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষক শৃঙ্গ পর্বত অভিযাত্রীদের কাছে। কিন্তু ২৯,০২৯ ফিট, বিশ্বের সর্বোচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা এখনও প্রতিবছর ৪ মিলিমিটার করে বাড়ছে। আরও যা জানা যাচ্ছে

● জর্জ এভারেস্ট, যাঁর নামে শৃঙ্গের নামকরণ হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। এই অবসরপ্রাপ্ত সারভেয়ার জেনারেল কিন্তু কখনও এভারেস্ট শৃঙ্গ দেখেনই নি।

● এভারেস্ট শৃঙ্গে প্রতি ১০ সফল অভিযানের একটি অন্তত শেষ হয় মৃত্যু দিয়ে। হিসেব মতো ২০০ মৃতদেহ সেখানে রয়েছে।

● রেইনহোল্ড মেসনার'ই প্রথম অভিযাত্রী যিনি একা এবং অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠেছিলেন ১৯৮০ সালে।

●এখনও পর্যন্ত সব থেকে প্রবীণ ৮০ বছরের ইউচিরো মিউরা, জাপানি অভিযাত্রী এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠেছেন।

● এবং সব থেকে কনিষ্ঠ

এভারেস্ট অভিযাত্রী হল ১৩ বছরের জরডান রোমেরো। মে, ২০১০ এ রোমেরো তার আগে নেপালের ১৫ বছরের কিশোর মিঙ কিপা'র রেকর্ড ভেঙে দেয়।

● এভারেস্ট শৃঙ্গে ২১ ঘন্টা যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ সময়, কাটিয়েছেন বাবু চিরি শের্পা এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙেন নি।

● এভারেস্টে 'ট্র্যাফিক জ্যাম' শব্দটি এখন পরিচিত। কারণ কখনও কখনও সেখানে একই সময় কয়েক'শ অভিযাত্রী গিয়ে হাজির হয়।

● এভারেস্ট শৃঙ্গে ১৯৭৪ সালে কোনও অভিযাত্রী আরোহণ করেন নি।

● নেপালের মোনি মুলে পাতি ও পেম দোরজি শেরপা ২০০৪ সালে এভারেস্ট শৃঙ্গে বিয়ে করেন। চুড়োয় না ওঠা পর্যন্ত তাঁদের এই পরিকল্পনা গোপন রেখেছিলেন সহ অভিযাত্রীদের কাছে। **সূত্রঃ লিস্ট ২৫.কম**

আবহাওয়া কি বদলে দিচ্ছে ক্রোমোজোম?

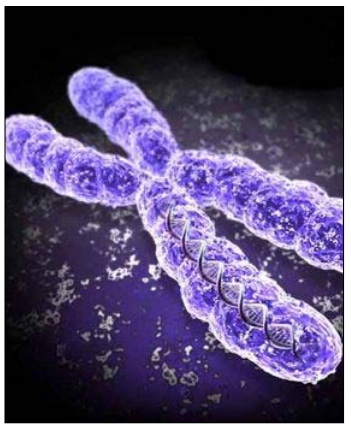

আমরা জানি বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যার এমন প্রভাব প্রকৃতিতে পড়ছে যে উদ্ভিদ সহ বহু প্রাণী অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই লুপ্ত। এখন অনেকেই আবার মানুষের ক্ষেত্রেও আশঙ্কা করছেন যে, তেমনটা ঘটবে না তো? কারণ পুরুষের দেহের পুরুষত্ববাহি ওয়াই ক্রোমোজোম ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর এটা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শিশু জন্মের ক্ষেত্রে একটা ওলোট পালট ঘটার সম্ভাবনা, যাতে মানব সমাজই হয়তো হুমকির মুখে পড়বে।

এমনিতে আমাদের প্রতি কোশের নিউক্লিয়াসে মোট ক্রোমোজমের সংখ্যা ২৩ জোড়া বা ৪৬ টি। তার মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। মেয়েদের দেহে থাকে দুটোই এক্স ক্রোমোজোম। আর ছেলেদের দেহে থাকে এক্স ও ওয়াই ক্রোমোজোম। কোনও সন্তানের ক্ষেত্রে যদি ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম এক্স এক্স হয় - তবে নবজাতক কন্যা সন্তান হয়। যদি এক্স ওয়াই হয় তবে সে হয় পুত্র সন্তান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওয়াই ক্রোমোজোম দিন দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে। যদি এই ক্ষয় অব্যাহত থাকে তবে তো একদিন ওয়াই ক্রোমোজোম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ একদিন পৃথিবীও পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে। তাহলে কি আর মনুষ্য সমাজ টিকে থাকবে?

ডঃ কজ্জল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মত করে কেইই বা ঘুমোয়

মানুষ বেশি ঘুমোয় না। ছ' সাত ঘন্টা হলেই তাদের হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের নিকট আত্মীয়দের দরকার হয় অনেক বেশি ঘুম। যেমন পিগ-টেলড ম্যাকাক ও লেমুরদের (দু ধরণের বাঁদর গোত্রীয় প্রাণী) চাই ১৪ আর ১৭ ঘন্টা ঘুম। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনিভারসিটিতে কয়েক'শ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘুম নিয়ে এক গবেষণায় এ কথা জানা গেছে।

তুলনায় কম ঘুমিয়েও মানুষ বেশ ভালই থাকে। কারণ, মানুষ যেটুকু সময় ঘুমোয় তার বেশ খানিকটা খুব গভীর ঘুমে কাটে। ফলে শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে অনেক তাড়াতাড়ি। সাধারণত মনে করা হয় যে মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রায় ফলেই যে এখন কম সময় ঘুমিয়ে কাটায়। অর্থাৎ, বিদ্যুতের আলো মানুষের রাত অনেক ছোট করে দিয়েছে। অনেকে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। কাজ করে, বই পড়ে, টিভি দেখে বা কম্পিউটার খুলে ভেসে বেড়ায় ইন্টারনেটের অসীম দুনিয়ায়। তাই মানুষ কম ঘুমোয়।

প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা

কিন্তু ডিউক ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা এমনটা বলছেন না। তাঁদের গবেষণায় তাঁরা দেখেছেন, পৃথিবীর যে সব প্রত্যন্ত প্রান্তে বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছয়নি, যেখানে মানুষ এখনও বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেই বাঁচে, সেখানেও মানুষজন ওই ছ' সাত ঘন্টার বেশি ঘুমোয় না। সেখানে লোকজন সূর্য ডোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু জেগে যায় আলো ফোটার অনেক আগেই।

বলা হচ্ছে মানুষ যখন থেকে মাটিতে লম্বা হয়ে শুতে শিখেছে, তখন থেকেই তার নিদ্রা হয়েছে অনেক গাঢ়। আদিমকাল থেকেই আগুন জ্বেলে মাটিতে অনেকে মিলে এক সঙ্গে শোয়ার অভ্যাস শুরু হয়। আগুন জ্বলার ফলে বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে, শেয়াল সাধারণত দূরে দূরে থাকত, আর অনেকে এক সঙ্গে থাকার কারণে সকলেরই মনে বাড়ত নিরাপত্তা বোধ। তাই ঘুমটা হত গভীর, আর ছ' সাত ঘন্টাই হত যথেষ্ট।

ইন্টারনেটের যুগেও সেই আদিম কালের ঘুমের অভ্যাসটা এখনও অটুট আছে।

সূত্রঃ সায়েন্স ডেইলি

হামিংবার্ডঃ সুন্দর পালকই তার কাল হল

লম্বায় ৫ সেন্টিমিটারেরও কম, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখি বলে পরিচিত সে। কিন্তু হলে কি হবে, নিজের থেকে বড় এমনকী বাজপাখিকেও সে সময় সময় তাড়া করে, যদি সে তার এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ছোট্ট কিন্তু দারুন সুন্দর রঙ তাদের। তারা খুব দ্রুত, সেকেন্ডে ৮০ বার ডানা ঝাপটায়, যার থেকে একটা শব্দ ওঠে। সেই কারণেই তার নাম হামিংবার্ড। এই হেন হামিংবার্ডও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার বা আই.ইউ.সি.এন'র লাল তালিকাভূক্ত হয়ে গেছে।

জানা যায় যে এক সময়ে তার সুন্দর পালকের জন্যই তাদের মারা হত। এখন অবশ্য অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মতো বসতি ধ্বংস হওয়াই তাদের বিপন্নতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রাতেও বদল ঘটচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে তাদের পরি-যাত্রার, তথা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াতের ধরনে। সাধারণত যে এলাকা তাদের বিচরণক্ষেত্র তার বাইরেও তারা চলে যাচ্ছে। যেখানে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের খোঁজ মিলছে না। এতেই বিপন্নতা বাড়ছে তাদের। এবং দেখা যাচ্ছে সব প্রজাতির হামিংবার্ডদের মধ্যেই কোনও না কোনও প্রজাতি হয় বিপদ সম্মুখীণ, নয় বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বিপন্ন যারা

হামিংবার্ডদের প্রধান খাদ্য হল ফুলের মধু, রেণু ও গাছের ছোটখাটো পোকামাকড়। যেহেতু হামিংবার্ডদের হৃদয়ের স্পন্দন খুব দ্রুত, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত এবং দেহের তাপমাত্রাও খুব বেশি তাই প্রতিদিন তাদের প্রচুর পরিমানে খাদ্যের দরকার হয়।

আলাস্কার দক্ষিণ-পূর্ব থেকে একেবারে চিলির দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাদের বসবাস। প্রায় ৩০০ প্রজাতির হামিঙবার্ড'র মধ্যে বেশিরভাগই ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের মধ্যে অবশ্য ১২ প্রজাতির হামিংবার্ড গরমের সময় উত্তর আমেরিকায় চলে যায়। আবার শীতের সময় ফিরে আসে ক্রান্তীয় অঞ্চলে। তারা মাইগ্রেট করে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার।

আমেরিকায় অনেকেই পরিযায়ী হামিংবার্ডদের আকর্ষণ করার জন্য বাড়ির পেছনের বাগানে তাদের পছন্দের গাছ লাগায়। যাতায়াতের পথে যাতে সেখানে নেমে তারা কিছু খাদ্য পেতে পারে। তারা সাধারণত বাঁচে ৩-৫ বছর।

সূত্রঃ ডিফেন্ডার.অরজ

দূষণে দিল্লি সব শহরকে হারিয়ে দিয়েছে

আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লি শহর বায়ু দূষণে পৃথিবীর আর সমস্ত শহরকে পেছনে ফেলে প্রথম হওয়ার শিরোপা জিতে নিল। সম্প্রতি বাতাসের গুণগত মান নিয়ে প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে এই শহরে বাতাসে পার্টিকুলেট ম্যাটার বা ভাসমান কণার ঘনত্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু'র নির্দেশিত সহনমাত্রার থেকে ১০ গুণ বেশি। এমনকী বায়ুদূষণের জাতীয় সহনমাত্রার থেকেও ৪ গুণ বেশি দিল্লির দূষণমাত্রা। বাতাসের এই ঘাতক ভাসমান কণা যে ক্রমশ শহরবাসীর জীবনের ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠছে তা নিয়ে তাই হইচই শুরু হয়েছে।

কারণ নতুন একটি সমীক্ষা বলছে যে বিশ্বে প্রতিবছর বায়ুদূষণের কারণে ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এবং এই দূষণ কমাতে না পারলে ২০৫০ সাল নাগাদ এই মৃত্যু বেড়ে দাঁড়াবে ৬০ লক্ষ ৬০ হাজারে। বলা হচ্ছে গোটা বিশ্বে এইচআইভি ও ম্যালেরিয়া মিলে যত মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, তার থেকেও অনেক বেশি নেয় ওই বায়ুদূষণ। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত ওই সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, চিনে প্রতিবছর ১০ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ মারা যায় সেখানকার বায়ু দূষণের কারণে। তারপরের স্থানেই আছে ভারত। এখানে মারা যায় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ।

বায়ুদূষণে জর্জরিত চিনের বেজিং শহরকেও কখনও কখনও ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিল্লি। ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সে। বায়ুদূষণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। ভারতে স্কুলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর ৩৫% এরই ফুসফুসের অবস্থা বেশ খারাপ। দিল্লি শহরে বায়ুদূষণের জন্য বিশেষত শীতের সময় মুখ্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হয় গাড়ি থেকে নির্গত বিষাক্ত ভাসমান কণা। যা শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অসুখের প্রধান কারণ। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'র রিপোর্ট বলছে - সারা বিশ্বে যে সব কারণে মানুষের মৃত্যু হয় তার প্রথম ১০ কারণের অন্যতম হল বায়ুদূষণ। ভারতে প্রথম প্রধান ৫ কারণের একটি। এবং দেখা যাচ্ছে শুধু দিল্লিতেই বছরে ১০-৩০ হাজার মানুষ এই দূষণের শিকার হচ্ছে।

শুদ্ধ বাতাসের সন্ধানে

এ বছর এই দূষণ সমস্যা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জানুয়ারি থেকেই দিল্লি শহরের রাস্তায় যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ শুরু হচ্ছে। প্রতিদিন আর সব গাড়ি রাস্তায় বার করা যাবে না। গাড়ির নাম্বার এবং ডেট বা তারিখের সংখ্যা মিলিয়ে গাড়ি পথে নামতে পারবে। পৃথিবীর বহু শহরেই বায়ুদূষণ কমাতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন ইটালি'র মিলান শহরে তিন দিন পথে প্রাইভেট গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। তা ছাড়াও প্রতিদিন দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছয় ঘন্টা মোটরগাড়ি, বাইক ও স্কুটার চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে সেখানকার বায়ুদূষণ কমাতে। প্যারিস, ফ্লোরেন্স এবং বেজিং'এও পরীক্ষামূলক ভাবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সূত্রঃ এনডিটিভি.কম

প্যারিসের পরিবেশ সম্মেলনে পৃথিবীর ১৫০ দেশ ঠিক করেছে তারা বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য এবার সক্রিয় হবে। উষ্ণায়ন রোধ করাই উদ্দেশ্য।

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: January 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● বৃষ্টি হচ্ছে কিনা ১৫০ মাইল দূর থেকে তা টের পায় হাতিরা।

● এখনও পর্যন্ত সব থেকে লম্বা পাখির পালক পাওয়া গেছে জাপানে। সেখানে একটি মুরগির লেজের দৈর্ঘ্য ৩৪.৭ ফিট।

● পৃথিবীর ৬৮ শতাংশ উদ্ভিদই বিপদসম্মুখীন, যারা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

● সব থেকে বেশি কথা বলা পাখি হল আফ্রিকার গ্রে প্যারট। বেশির ভাগ প্যারটরা শিখতে পারে সাধারণত ৫০ শব্দ । কিন্তু গ্রে প্যারটরা ৮০০ টারও বেশি শব্দ বলতে পারে।

● ওষুধ তৈরিতে প্রায় ৭০ হাজার উদ্ভিদের ব্যবহার হয়।

●বাওবাব আফ্রিকার এক আশ্চর্য গাছ যে নিজের দেহে তথা কান্ডে ১০০০ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার লিটার পর্যন্ত জল ধারণ করে রাখতে পারে।

খরায় বিপন্ন হবে বন

আগামী দিনে গাছেরা কেমন থাকবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে মনে করা হচ্ছে তাদের সবাই হয়ত সুখে থাকবে না। আর গাছেরা ভাল না থাকলে, মানুষ কতটা ভাল থাকবে তা নিয়েও সংশয় আছে। পৃথিবীতে এখন মানুষের কান্ডকারখানার জেরে আবহাওয়া পরিবর্তনের যুগ চলেছে। তাপ বাড়ছে গ্রহের। আর এর ফলে খরা আর অতি বৃষ্টি দুইই বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের একাংশ বলছেন যে পৃথিবীর নানা দেশে ঘন ঘন অনাবৃষ্টি আর খরা দেখা দেওয়ার ফলে জঙ্গলে জঙ্গলে অনেক গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইফনিভারসিটির জীববিজ্ঞানী এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে আবহাওয়ার খুব বেশি পরিবর্তন গাছেরা সইতে পারে না। তাই কোথাও যদি বার বার খরা হতে থাকে, তাহলে বিপন্ন হয়ে পড়ে সেখানকার গাছ।

একটি গাছ সাধারণত তার শেকড়ের মাধ্যমে জল তোলে। মাটিতে জল কমে গেলে তাদের অনেক বেশি কসরত করতে হয় বিন্দু বিন্দু জল ওপরে তুলতে। তবে অনাবৃষ্টি চলতেই থাকলে, মাটিতে সঞ্চিত জল ক্রমশ কমে গেলে, গাছেরা একটা সময় হাল ছেড়ে দেয়। আর তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন অনেক গাছ ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স

ক্যুইজ?!?!

১। রঞ্জি ট্রফির-র ইতিহাসে সব থেকে বেশি রান করেছনে কে?
(ক) বিজয় হাজারে (খ) বীরেন্দ্র সেহবাগ (গ) ওয়াসিম জাফর (ঘ) হৃষিকেশ কান্তিকার

২। পৃথিবীর সমস্ত মহিষের অর্ধেকেরও বেশি কোন দেশে?
(ক) ভারত (খ) কেনিয়া (গ) ভিয়েতনাম (ঘ) ইন্দোনেশিয়া

৩। এই চার দ্বীপের মধ্যে কি মিল?
(ক) নিউগিনি (খ) বোর্নিও (গ) আয়ারল্যান্ড (ঘ) সাইপ্রাস

৪। প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে নীচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) পাঁচ মহাদেশের সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের যা আয়তন তার থেকেও এটি বড় (খ) এটি বৃহত্তম মহাসাগর, তবে গভীরতম নয় (গ) পৃথিবীর সমস্ত আগ্নেয়গিরি'র প্রায় তিন চতুর্থাংশ বা ৭৫% এর এলাকাতে (ঘ) সব থেকে বেশি সংখ্যক দ্বীপ এই মহাসাগরে

৫। দোস্ত মহম্মদ খান ১৭২৪ সালে বর্তমান কোন শহরের পত্তন করেছিলেন?

(ক) সেকেন্দ্রাবাদ (খ) লক্ষ্ণৌ (গ) আজমের (ঘ) ভোপাল

৬। সাদাত হোসেন মন্টো প্রধানত কি ভাষাতে লিখতেন
(ক) উর্দু (ঘ) গুরমুখি (গ) হিন্দি (ঘ) ইংরেজি

৭। পশ্চিম ভারতের একটি জায়গার নামের নাম পাথর থেকে কাটা নগর। এটি কেন বিখ্যাত ছিল?

৮। ভারতের প্রথম কম্পিউটার কোথায় বসানো হয়েছিল?
(ক) প্রধান মন্ত্রীর দফ্তর (খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (গ) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (ঘ) টাটা স্টিল

৯। ভারতের কোথায় সব থেকে বেশি ভারতীয় পর্যটক যান?
(ক) লাল কেল্লা, দিল্লি (খ) তিরুপতি বালাজি মন্দির, অন্ধ্রপদেশ (গ) তাজমহল, উত্তর প্রদেশ (ঘ) অজন্তা-ইলোরা গুহা, মহারাষ্ট্র

১০। সব থেকে বেশি তৃণভূমি কোন মহাদেশে?
(ক) এশিয়া (খ) উত্তর আমেরিকা (গ) দক্ষিণ আমেরিকা (ঘ) আফ্রিকা।

উত্তর : ১/গ; ২/ক; ৩/চারটেরই একটি ভাগ অন্য স্বাধীন দেশ

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com